গোধূলীর গান –১

হিফজুর রহমান

এক নিভৃতচারীর গল্প

শুরুটা মীর ভাইকে দিয়ে না করলেই নয়। সাত-এর দশকের শেষভাগে রাজশাহী থেকে একটি জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত হল। নাম হল দৈনিক বার্তা। দেশের সব প্রখ্যাত সাংবাদিক গিয়ে যোগ দিলেন তাতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কামাল লোহানী, আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী এবং মীর নুরুল ইসলাম বা আমার মীর ভাই। পত্রিকাটির সম্পাদক প্রথমে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী এবং পরে নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী। আর বার্তা সম্পাদক ছিলেন মীর নুরুল ইসলাম। বিভাগীয় শহর হলেও রাজশাহীর মতো ছোট্ট মফস্বল শহরে অ্যাতোসব নাম করা সাংবাদিকের উপস্থিতি ছিল রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং আলোচনার বিষয়। ওই শহরে তাদের ধারণ করাও ছিল কঠিন। তারপরও তাঁরা খুব অল্পসময়ের মধ্যেই রাজশাহীর প্রাণে পরিণত হয়েছিলেন।

অনেকটা নাটকীয়ভাবেই যোগ দিয়ে ফেললাম দৈনিক বার্তায়, শিক্ষানবীশ সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। তারপর কিছুদিন রিপোর্টার হিসেবেও কাজ করেছি সেখানে। প্রথম দিকটায় মীর ভাইয়ের খুব যে প্রিয়পাত্র ছিলামনা সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। তার কারণও ছিল। নাইবা বললাম সেকথা। ওই প্রসঙ্গটা আমার জন্যে খুব একটা প্রীতিকর নয়। সৌম্যকান্তি মীর ভাইয়ের মাথায় তখন ছিল কাঁচা-পাকা চুল। আমার যোগদানপত্র নিলেন কোন কথা না বলেই। আমার দিকে চাইছিলেনওনা খুব বেশি। খুব মৃদুভাষিও ছিলেন মীর ভাই। মনে মনে জেদ ধরেছিলাম, নাঃ এই লোকটাকে জিততে হবে এবং কাজ দিয়েই। ওই সময় যাঁরা আমার সহকর্মী ছিলেন, তারা জানেন, ওই কাজটা করতে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি। তবে কষ্ট হয়েছিল প্রচুর। কারণ, কাজের ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন তিনি। একেবারে পারফেকশনিস্ট যাকে বলে। একবার তার স্নেহের ছায়ায় ঢোকার পর তিনিই একটানে একেবারে তার হৃদয়ের কন্দরে স্থান করে দিয়েছিলেন। সেটিই আজ আমার অনুভবে অনেক বেশি করে অনুরণন ঘটায়।

বার্তা'র সংবাদকক্ষে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে মীর ভাইয়ের কাজের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, জীবন সংগ্রামের কথা বলতেন। তখনো জীবন সংগ্রামের আঁচ গায়ে না লাগায় ভাবতাম, কতোইনা বিচিত্র হতে পারে একজন মানুষের জীবন!

১৯৭৫ সালে সব পত্রিকা বন্ধ করে মাত্র চারটি জাতীয় দৈনিক টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। মীর নুরুল ইসলাম তখন ছিলেন পুর্বদেশ-এর বার্তা সম্পাদক। ওই পত্রিকা না টেকায় মীর ভাইও বেকার হলেন আরো শত শত সাংবাদিকের সাথে। পত্রিকায় গুরুত্বপুর্ণ পদে থাকায় মীর ভাইকে তখন কাস্টমস-এর সহকারী কালেকটরের চাকুরী সাধা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের সাথে সাথে

অন্যদেরও বিস্ময়ে ডুবিয়ে দিয়ে ওই চাকুরী প্রত্যাখ্যান করলেন মীর নুরুল ইসলাম। আসলে তিনি তো আমৃত্যু সাংবাদিক থাকতে চেয়েছিলেন। অথচ তারই জুনিয়র কেউ কেউ ওইরকম চাকুরী নিয়ে, বিবেক পদদলিত করে অপ-আয় দিয়ে কোটিপতিতে রূপান্তরিত হয়েছেন আমাদেরই এই বিষম সমাজে।

এদিকে সরকারী চাকুরীতে যোগ না দিয়ে আজীবন সংগ্রামী মীর ভাই সাংবাদিক থাকার সংগ্রামেই নিয়োজিত রইলেন। দীর্ঘদিন বেকার থাকার পর ১৯৭৬ সালের শেষভাগে এসে মীর নুরুল ইসলাম তার আরো সব বেকার অথচ নিবেদিত ও কর্মনিষ্ঠ সাংবাদিকের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলেন দৈনিক বার্তায়।

সাংবাদিকতা পেশার প্রতি প্রচন্ডরকম অঙ্গীকারবন্ধ, স্বল্পভাষী এবং সৎ মানুষ মীর নুরুল ইসলাম বলতেন, 'একজন সৎ সাংবাদিকের কখনো কোন বন্ধু থাকতে পারেনা।' আর আমাকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে বলতেন, 'তোমাকে কেউ কিছু সেধে শেখাবে না। যা শিখবার, জোর করেই শিখতে হবে।' জোর করতে হয়নি তেমন। তবে, প্রায়ই প্রথম পাতার লে-আউট করবার সময় মীর ভাইয়ের প্রায় ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতাম। প্রায় নিউজেরই হেডিং টাইপ, আকার সব কিছু নিয়ে এন্তার প্রশ্ন করতাম। একটুও বিরক্ত না হয়ে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিতেন, নিউজের মেরিট বুঝে কিভাবে হেডিং বড়-ছোট করতে হয়; কিভাবে পাতায় ভারসাম্য আনতে হয় - এইসব। একটা মানুষ তার পেশার প্রতি কতোটুকু নিবেদিত প্রাণ হতে পারে, সেটাও দেখতাম মীর ভাইয়ের মধ্যেই। প্রয়োজনে দিনের পর দিন তাকে পড়ে থাকতে দেখেছি পত্রিকা অফিসে।

বিনিময়ে এই পেশা থেকে মীর ভাই কি পেয়েছেন, সেটাও জানার প্রয়োজন রয়েছে। যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি সমর্থ হয়েছিলেন রাজশাহীর মতো এক দুর এলাকা থেকে একটি প্রায় প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিক বের করতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে। সংবাদপত্র শিল্পের সাথে যারা জড়িত, তারা জানেন একজন বার্তা সম্পাদকই একটি দৈনিকের হৃদপিন্ড। অথচ এই হৃদপিন্ডকেই চটকাতে দেখেছি আমি রাজশাহীতে। এই মহান (!) কাজটি করেছেন প্রগতিশীল সাংবাদিকের ভেকধারী কয়েকজন মাত্র। পরিচয়ে তাদের কেউ কেউ বামপন্থী হলেও তৎকালীন বিএনপি সরকারের সহযোগিতা নিয়ে তারা মীর ভাইকে রাজনৈতিকভাবে ব্র্যান্ডেড করেছেন, চাকুরীচ্যুতও করেছিলেন। চাকুরীচ্যুতির পরও মীর ভাইয়ের চেহারা ম্লান হতে দেখিনি একটুও। বরং আমার ক্রোধ প্রশমিত করবার জন্যে সান্তনার স্বরে বলেছিলেন, 'এই পেশায় এসেছো যখন, তখন যে কোন সময়ই চাকুরী হারানোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখো। তাহলে কষ্ট পাবে কম।' মীর ভাইয়ের ওই কথা যে আমার জীবনেও কতো নিষ্ঠুরভাবে ফলে যাবে সেটা তো ওই ১৯৮১ সালে বুঝতে পারিনি। আর ওইসব বিপ্লবীরা আবার ভেক পাল্টেছেন। তাদের মধ্যে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য হবার কারণেই সম্ভবতঃ প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জানিনা তিনি এখনো বিপ্লব করছেন কি না। না কি খুঁজে দেখছেন, চেয়ারম্যান মাও এই পরিস্থিতিতে কি করবার সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখেছেন!

রাজশাহী থেকে মীর ভাই বেকার অবস্থায় ঢাকা এলেন ১৯৮১ সালের জুন মাসে। তার পরপরই বাংলার বাণী পুনঃপ্রকাশিত হল। মীর ভাইকে তারা নিয়ে নিলেন আবার সেই বার্তা সম্পাদক হিসেবেই। অক্টোবর মাসে আমাকেও নিয়ে এলেন তিনি। সেটা ছিল আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। বাংলার বাণীতে যোগ দেবার প্রস্তাব পাবার পর ষোল শ' আটচল্লিশ টাকা বেতন পাবো শুনে প্রথমে একটু ভয় পেয়েই মীর ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই টাকা দিয়ে চলতে

পারবো?’ একে কম টাকা, আর তারপর মফস্বল থেকে এবং মায়ের আঁচল থেকে বেরিয়ে সরাসরি ঢাকা এসে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আতঙ্ক থেকেই মুলতঃ ওই প্রশ্ন করেছিলাম। সম্ভবতঃ আমার বালখিল্যতা দেখেই একটু মুচকে হেসে মীর ভাই বলেছিলেন, ‘হিফজুর, আমি তোমাকে যতোটুকু চিনি, তাতে আমার মনে হয় তোমার এই শহরে খাওয়া-পরার কোন অভাব হবে না।’ ওই কথা ক’টিকেই আশির্বাণী হিসেবে ধরে নিয়ে নতুন জীবনের বন্ধুর পথে চলা শুরু করলাম।

মীর ভাইয়ের চাকুরীতো হল, কিন্তু রাজশাহী থেকে যে দুর্ভাগ্যের শুরু, সেটার আর শেষ হল না। খাতায় কলমে একটা বেতন থাকলেও আমাদের সেই বেতনের টাকা একসাথে দেখবার সৌভাগ্য বাংলার বাণীতে হয়নি। এমনিতেই বেতনের টাকায় মীর ভাইয়ের কেন আমাদের কারোরই চলতোনা। তার ওপর সেই টাকা একসাথে মিলতোনা কখনোই। ফলে, বাড়িওয়ালা থেকে শুরু করে মুদিওয়ালা কার না গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে অমাদের। আমার বাসা কাছেই থাকাতে খুব একটা অসুবিধে হতো না হেঁটে চলে আসতে। কিন্তু, মীর ভাইকে আসতে হতো সেই মগবাজার থেকে। প্রায়ই হেঁটে আসতেন তিনি মতিঝিল পর্যন্ত। সেই ক্লান্তির ছাপ তার চোখে-মুখে ফুটে উঠলেও মুখে কোন কথা বলতেন না তিনি। অবশ্য ওই ধৈর্য না থাকলে অ্যাতোবড় সংসার চালাতেনই বা কি করে তিনি!

দৈনিক বাংলা

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

নৃশংস হত্যা

ভুট্টো-টিক্কা চক্রের ফ্যাসিস্ট নির্যাতন

PEOPLE'S FRONT

সংসার কি চলতো মীর ভাইয়ের? মোটেই না। অর্থকষ্টের তীব্র যন্ত্রণায় মীরভাবীর (এইভাবেই ডাকি আমরা মীর ভাইয়ের স্ত্রীকে) চোখ ছলোছলো হতে দেখেছি অনেকদিনই। তবুও মীর ভাইয়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করতে শুনিনি কখনো। তবে মাঝে মধ্যে ক্ষেপে গিয়ে আমাদের বলতেন, ‘তোমাদের মতো সাংবাদিকদের মেয়ে দেবেনা কেউ বিয়ের জন্যে।’ প্রচন্ডরকম সৎ মীর ভাইয়ের স্ত্রী অর্থ্যাৎ আমাদের মীর ভাবী কি জানতেন, এই দেশে অনেক লক্ষপতি, কোটিপতি সাংবাদিকও আছেন?

অ্যাতো অভাবের মধ্যেও সবসময়ই হাসি ঠাট্টা ছিল তার জীবনের অংশ। নিজের প্রবল অক্ষমতা নিয়েও অবলীলাক্রমে ঠাট্টা করতেন তিনি। দৈনিক বার্তায় থাকতে একবার তার নামে পরিবার পরিকল্পনা সমিতি থেকে চিঠি আসতে দেখে কেবল কৌতুহলবশে খুলে দেখলাম কি আছে তাতে। এখানে বলে নিই, মীর ভাইয়ের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল দশ। চিঠি দেখে বুঝলাম, মীর ভাই পরিবার পরিকল্পনা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ভাবলাম, এইই সুযোগ তাকে একটু বিপাকে ফেলবার জন্যে। সন্ধ্যের পর অফিসে আসতেই তাকে প্রশ্ন করলাম, ‘মীর ভাই আপনারে পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সদস্য বানাইলো কি বুইঝা (মাঝে মধ্যে আমরা এইভাবেই কথা বলতাম)?’ আমার প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই উনি বলে উঠলেন, ‘আরে ছাগল, এইটাও বুঝলা না! পরিবার পরিকল্পনা করা ক্যান দরকার, এইটা আমি ছাড়া আর ভাল বুঝবো

কে?' ছাগল শব্দটা তার খুব প্রিয় ছিল। কখনো কখনো আদর করে, আবার কখনো খুব রেগে গেলে তিনি এই শব্দটা ব্যবহার করতেন আমাদের ওপর।

বাংলার বাণী থেকে আমরা ১৯৮৪ সালে মীর ভাইয়ের নেতৃত্বে গিয়ে যোগ দিলাম তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদের মালিকানাধীন পত্রিকা দৈনিক জনতায়। ওখানে ভাল বেতনের অফার ছিল, নিয়মিত বেতন পাবার আশ্বাস ছিল। বাংলার বাণীতে নিয়মিতভাবে অনিয়মিত বেতন পাবার ফলে নিয়মিত বেতন পাবার আশ্বাসই ছিল আমাদের কাছে অনেকখানি। তার ওপর মীর ভাই হলেন সম্পাদক দৈনিক জনতার, যদিও তার মাথার ওপর প্রধান সম্পাদক করে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল আলহাজ্ব শামসুল হুদাকে। এরশাদ সাহেবের এক নিকটাত্মীয় মোস্তাফিজুর রহমান ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক। আর পত্রিকা প্রকাশের কিছু দিনের মাথায়ই সামরিক বাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজর আশফাককে নিয়োগ দেয়া হল পত্রিকার চীফ এক্সিকিউটিভ করে। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই দৈনিক জনতার প্রশাসন হয়ে দাঁড়ালো এক জগাখিচুড়ি প্রশাসন। পত্রিকার কাজ হতো হাটখোলায়, আর এর ভারচুয়াল প্রশাসন চলতো মোস্তাফিজুর রহমানের টেনিস কমপ্লেক্সের অফিস থেকে।

আজীবন কর্তব্যনিষ্ঠ ও সংগ্রামী মীর ভাইয়ের পক্ষে দৈনিক জনতার যাবতীয় অনিয়ম মেনে নেয়া ছিল খুবই কঠিন। এছাড়া পত্রিকার প্রশাসনের সাথে সাংবাদিকদের বিরোধ বাড়তে বাড়তে এমনই পর্যায়ে গেল যে মাত্র এক বছরের মাথায়ই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিলেন মালিকপক্ষ। সেই সঙ্গে চললো ছাঁটাই। প্রথম কোপই পড়লো বড় গাছের ওপর। হুদা ভাই, মীর ভাই, রফিকুল হক দাদু ভাই, বার্তা সম্পাদক রঞ্জন দা এঁদের সবার চাকুরী গেল। আর অন্য সব চুনোপুঁটিদের মধ্যে আমারটাও গেল। আমি আমার চাকুরী নিয়ে খুব একটা চিন্তিত ছিলাম না। কারণ, ততোদিনে সাপ্তাহিক হেরাল্ড, ছুটি, সেবা প্রকাশনিতে লিখে আমার সংসার মোটামুটি চলেই যেত। কিন্তু, ঘোর বিপদে পড়লেন মীর ভাই। পত্রিকার সম্পাদক হওয়ায় রেডিও ও টিভির খন্ডকালীন কাজ তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ফলে, সংসার নিয়ে চরম বিপাকে পড়তে হল তাকে। অথচ একটু আপোষ করলে দৈনিক জনতায়ই আবার তার চাকুরী হতে পারতো। এই ঘোর বিপদের সময়ও তাকে একটুও বিচলিত হতে দেখিনি। তার মুখের সেই মধুর হাসি আর অভয়বাণী কখনো অধরা হয়নি।

এরপর মীর ভাই একবার চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ, আবার একবার বাংলার বাণী করে শেষ পর্যন্ত যোগ দিলেন বেক্সিমকো গ্রুপের দৈনিক মুক্তকণ্ঠে। কিন্তু, অর্থনৈতিক স্বস্তি মীর ভাই এজীবনে আর পেলেননা। দ্বিতীয় দফায়ও বাংলার বাণীতে বোধহয় তাকে কিছু বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (!) রেখে আসতে হয়েছিল, যেমনটা হয়েছিল প্রথম দফায়। আর মুক্তকণ্ঠের অবস্থাও বোধহয় তেমনই ছিল।

কর্তব্যনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিক আমাদের শ্রদ্ধেয় এই মীর ভাই গত ২ অক্টোবর রাতে কাজ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কয়েক হাসপাতাল ঘুরে শেষপর্যন্ত শমরিতা নার্সিং হোমে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। চিকিৎসকদের ভাষায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুতে তার পরিজন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তেমনি না হলেও অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত আমিও হয়েছি, যদিও অনেক দিনই হয়ে গেল আমি আর সাংবাদিকতা পেশার সাথে নেই। মীর ভাইদের মতো নিবেদিতপ্রাণ থাকতে পারিনি বলেই হয়তো ছিটকে পড়েছি দানবাক্রান্ত এই মহান পেশা থেকে। তারপরও মীর ভাই ছিলেন আমার জন্যে অনেক কিছু। শেষ যেদিন মুক্তকণ্ঠে দেখা হয়, সেদিন তাকে একটু ম্লান দেখেছিলাম। বোধহয় ইচেছর বিরুদ্ধেও অনেককিছুই তাকে করতে

হচ্ছিল, সেজন্যেই খানিকটা ম্লান দেখাচ্ছিল তাকে। মীর ভাই খুব ধীর স্বরে বলছিলেন, ‘মীরপুরের (সাংবাদিকদের জন্যে দেয়া জমিতে) বাড়ির কাজটাও যদি শেষ করে দিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে তোমার ভাবীদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই হতে পারতো’।

শেষ পর্যন্ত মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও তার জীবদ্দশায় হয়নি। অধিকাংশ সৎ সাংবাদিকেরই জীবন চিত্র এরকমই। তবুও মীর ভাইয়ের এই পরিণতি মেনে নেয়া বড় কঠিন। তার কোন কিছুই হতোনা, কারণ মুখ ফুটে নিজের জন্যে কিছু চাওয়া ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ, একথা বোধহয় তার পরম শত্রুরাও স্বীকার করবেন। সারাজীবন নিভৃতচারী এই কলমসৈনিকের মৃতদেহ যখন তার রামপুরার ছোট্ট বাসভবন থেকে টাঙ্গাইল নেয়া হচ্ছিল তখন কোন নেতা, কোন বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন না তার ঢাকা থেকে শেষ বিদায়ে একটু সঙ্গ দিতে বা বড় কোন বক্তৃতা দিতে। আমার মনে হয় তাতেই বোধহয় মৃত মীর ভাইও স্বস্তি পেয়েছিলেন। অনেক চমৎকার গ্রন্থের স্রষ্টা লেখক-সাংবাদিক মীর ভাইয়ের বড় অভিমান ছিল। আজীবন অনেক অবহেলা আর বঞ্চনা পেতে পেতেই বোধহয় সেই অভিমান বাসা বেঁধেছিল তার মনে। আর সেই অভিমানের বশেই বোধহয় মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন, তার মৃতদেহ যেন প্রেসক্লাবে না নেয়া হয়।

নিভৃতচারী এই মানুষটি অনেকটা নিভৃতেই চলে গেলেন আমাদের এই জীবন থেকে। অজান্তেই চোখের কোলটা জলে ভিজে ভিজে আসে। আবার মুছে নিই তাড়াতাড়ি। মনে হয় মীর ভাই যদি বলে ওঠেন, ‘আরে ছাগল এভাবে কোন পুরুষ মানুষ কাঁদে নাকি?’

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ১৭/০৬/২০১১, ইমেইল # hifzur@dhaka.net

[পরবর্তি সংখ্যায় সেবা প্রকাশনীর সাথে ঘর-বসত এবং আরো কিছু....]

হিফজুর রহমানের আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকামারুন